রবীন্দ্রচেতনায় শিলাইদহ

আ বু ল আ হ সা ন চৌ ধু রী।।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে শিলাইদহের নাম গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। শিলাইদহ সেকালের নদীয়া আর এখনকার কুষ্টিয়া জেলার একটি অখ্যাত গ্রাম রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই আজ তার বিশ্বজোড়া পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথের লোকায়ত মানস উদ্বোধনেও তার ভূমিকা স্মরণ করতে হয়। শিলাইদহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র কত নিবিড় ও ফলপ্রসূ ছিল তার পরিচয় মিলবে তার পত্রাবলি, নানা স্মৃতিচর্চা আর প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহের পরিচয় বহুকালের। সেই ছেলেবেলায় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিলেন শিলাইদহে। বিশ্বনাথ শিকারির বাঘ শিকারের কাহিনী শোনার স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়নি। ছেলেবেলা জীবনস্মৃতিতে বলেছেন এসব কথা। সে সময়ের অন্তরঙ্গ স্মৃতির পরিচয় মেলে তার কবিতায়। সেই সুখস্মৃতির দোলা তাকে শেষ জীবনেও আন্দোলিত করছে। স্মৃতিতাড়িত কবির অনুরাগ গাঢ় উচ্চারণ শোনা যায় এই কবিতায় ঃ

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কি জানি হবে দুয়েক বছর বেশী আরো।
পুরাতন নীলকুঠি দোতলার পর ছিল মোর ঘর। ...
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর/তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর। ...
সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে/বাঘ-শিকারের গল্প নিস্তব্ধ ছাতের উপর
মনে হত সংসারের সবচেয়ে আশ্চর্য খবর।

নাগরিক জীবনের বাইরে প্রকৃতির উদার-বিস্তৃত-অনাবিল রূপ ও রসে শিলাইদহ এমনিভাবে তার কিশোর-মনকে সেদিন কেড়ে নিয়েছিল।

তারপর যৌবনে যখন শিলাইদহে জমিদারির ভার নিলেন, এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে

তার পরিচয় আরো নিবিড় হলো। শুরু হলো জমিদারি ও আসমানদারির দ্বৈতপালা। এই প্রথম তিনি পল্লীজীবনের কাছাকাছি এলেন প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অস্তিত্বকে গভীরভাবে অনুভব করলেন। জীবনের যে একটি বড় সত্য গ্রামজীবনের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি উপলব্ধি করলেন এখানে এসে। তিনি লিখলেন ঃ পৃথিবী কি আশ্চর্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।

রবীন্দ্রসাহিত্য-পর্বের স্বর্ণযুগ শিলাইদহবাসের কাল। অজস্র লিখেছেন তিনি এইখানে এসে। বিচিত্র বিপুল সে রচনারাশি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, বলাকা, নৈবেদ্য, কল্পনার অধিকাংশ কবিতাই শিলাইদহে বসে তিনি লিখেছেন। দুই বিঘা জমি, সুখদুঃখ ও আরও অনেক কবিতায় শিলাইদহের স্মৃতি ও শ্রুতির ছবি ধরা পড়েছে। কথা ও কাহিনী, চিরকুমার সভা এবং গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যর গান সেও এই শিলাইদহবাসেরই ফল। তবে পদ্মালালিত ভূভাগে রবীন্দ্রসৃষ্টিকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তার ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জনক। আর শিলাইদহেরেই তার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলো লিখিত হয়েছে। এসব ছোটগল্পের ভেতর শিলাইদহের জীবন-জনপদ, পল্লী-প্রকৃতি ও পদ্মার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতার এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ আমার ধারণা বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখার উৎসই যেন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে। এমন আর কোথাও হয়নি। এই সময় তিনি অনর্গল কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লিখে গেছেন এক দিনের জন্যও কলম বন্ধ হয়নি। শিলাইদহের যে রূপবৈচিত্র্য তার মধ্যে পেয়েছিলেন তিনি লেখার অনুকূল পরিবেশ। তাই রবীন্দ্রমানসকে বুঝতে হলে তার এই পর্বের সাহিত্য-প্রয়াসের পরিবেশ ও প্রেরণার উৎস জানা প্রয়োজন। পদ্মা ও শিলাইদহ-নদী ও জনপদ এই দুই মিলে তবে একটি ভূখ ে র পূর্ণ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-জীবনের সঙ্গে তাই পদ্মাও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পদ্মা ছাড়া শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বকে কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নদীর পালিত জীবনকে পদ্মা নানাভাবে সমৃদ্ধ ও মনোময় করে তুলেছে। তাই তো কবি বলেছেন ঃ বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা আমার যথার্থ বাহন..। পদ্মার দান কবি দুহাতে গ্রহণ করেছেন। প্রায়ই তিনি বোটে পদ্মায় বাস করতেন। পদ্মাকে তিনি শিলাইদহবাসের নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছিলেন। তার শিলাইদহের জীবন অনেকখানিই পদ্মাসর্বস্ব। একটি চিঠিতে কবি বলেছেন ঃ

পদ্মা আগে কাছে ছিল এখন বহু দূরে সরে গেছে। একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখন আসতুম, তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার

আলাপ চলতো। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি মাঝখানে কত মাঠ কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পরেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা।

শেষ জীবনেও তিনি ভুলতে পারেননি যৌবনের সঙ্গী পদ্মাকে। তাই কোপাই নদীকে নিয়ে যে কবিতা লিখলেন তাতেও রয়ে গেল পদ্মার প্রসঙ্গ ঃ

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়/মনে মনে দেখি তাকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নবীন বাউলের বসতি ছিল, এ তথ্য তিনি শিলাইদহে এসেই প্রথম আবিস্কার করতে পেরেছিলেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব সাধক-স্বাধিকার সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালন ফকিরের শিষ্যশাবকের কথা উল্লেখ করতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু এর সপক্ষে কোনো জোরালো তথ্য-প্রমাণ মেলেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লালনের পরিচয়ের কথা জানা যায়। লালনের একটি প্রতিকৃতিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ না ঘটলেও রবীন্দ্রমানসে লালনের যে একটি প্রভাব পড়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের কোন কোন গানে এই প্রভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। শিলাইদহ ডাকগরের গগন হরকরা রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিলেন। গগন ছিলেন একজন বাউলকবি নেচে নেচে গান গেয়ে চিছি বিলি করতেন। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে পরিচিত ও খ্যাতিমান হন। শিলাইদহের সর্বক্ষেপী বোষ্টমীর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের গভীর সখ্য ছিল। বোষ্টমীর কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গৌরসুন্দর মোর। এই সর্বক্ষেপীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোষ্টমী গল্পে অশর করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহের বাউল সম্প্রদায়ের যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল তা তিনি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামণির ভূমিকা ও অন্যত্র স্মরণ করেছেন। এই মরমী সাধকদের লক্ষ করেই কবি লিখেছেন ঃ

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রোদ্রে সেই
পদ্মা নদীর ধারে
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা

পাকা দেউলের পুরাতন ভিত
ভেঙ্গে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে
গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

শিলাইদহের এই বাউল-পরিবেশই তাঁকে রবীন্দ্রবাউলে রূপান্তরিত করেছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভারততত্ত্বের বিশিষ্ট প তি ডক্টর দুসান জাবভিটেল রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহবাসকে তার জীবন ও সাহিত্য-পর্যালোচনায় খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহেরও প্রসঙ্গেও শিলাইদহের নাম করতে হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তিনি শিলাইদহ, কয়া, জানিপুর, পাণ্টি, কুমারখালী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি লালন ফকির ও গগন হরকরার বাউল গানও শিলাইদহ অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার প্রধান সহায় ছিলেন শিলাইদহ ঠাকুর এস্টটেরই এক কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্য। শিলাইদহই যে তার লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পকলা সংগ্রহের প্রধান ও উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল সে সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার ও বিনয় ঘোষ সাক্ষ্য দিয়েছেন।
শিলাইদহ ছিল রবীন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্র। কবির শিল্পী মানসের সার্থক নবজন্ম হয়েছিল এখানে। শিলাইদহের সঙ্গে তার ছিল নাড়ির যোগ। প্রমথনাথ বিশী এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসর তিনটি স্থানই রবীন্দ্র-কল্পনা পুষ্টিসাধনে সাহায্য করেছে, তবে যে শিলাইদহ সমধিক কথিত তার একটি কারণ সম্পত্তি ভাগাভাগি না হওয়া অবধি এখানেই তার বেশি যাতায়াত ছিল, একসময়ে কয়েক বছর সপরিবারে বাস করেছিলেন আর চিঠিপত্র ও অন্য রচনায় শিলাইদহের উল্লেখ করেছেন সবচেয়ে বেশি। আর একটি কারণ পদ্মা। ...সংক্ষেপে বলা চলে যে, তার কাছে শিলাইদহ এ অঞ্চলের প্রতিনিধি, তার উল্লেখেই যেন সকলের নাম উচ্চারণ করা হল। শিলাইদহবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দান তিনি জীবনভর পেয়ে এসেছেন। এদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বাবু মশাই। পাশাপাশি প্রজারা তাকে অসংকোচে তুই, তুমি বলেও সম্বোধন করতো। জমিদারের সঙ্গে প্রজার পোশাকি দূরত্ব ঘুচে এক সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ কখনোই তাদের সঙ্গে দূর রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ যেন প্রজা-পরিবারেরই একজন ছিলেন তাদের পরমাত্মীয়, আপনজন। শিলাইদহের লোকজীবনের সঙ্গে তার ছিল একান্ত যোগ। তার

শিল্পসাহিত্যকর্মে এ উপলব্ধির প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে।

শিলাইদহের সঙ্গে তার সম্পর্ক যে কতখানি গাঢ় ও গভীর তার সাক্ষ্য মিলবে ছিন্নপত্র-জীবনস্মৃতি-ছেলেবেলায়। কবি নৌকায় ঘর বেঁধেছেন পদ্মা-দুহিতা গড়াই নদীর ওপর। সম্মুখে কুষ্টিয়া, পাশ্চাতের প্রেক্ষাপট জুড়ে আছে শিলাইদহ। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। আকাশ খুলে ধরেছে তার নীল অনুবাদ। শান্ত-স্তব্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্যের এ এক অনন্তরূপ। কবি লিখলেন ঃ আমি প্রায় রোজই মনে করি এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব! আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই স্তব্ধ গোরাই নদীটির ওপর, বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিত মুগ্ধ মনে জলিবোটের ওপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পারব! হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনও ফিরে পাব না। শিলাইদহে না এল নিসর্গ-স্নাত কবি হয়তো এই কথাটি এমন করে বলতে পারতেন না।

ঠাকুরবাড়ির জমিদারি ভাগাভাগি হলো। শিলাইদহ পড়লো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে। রবীন্দ্রনাথ পেলেন শাহজাদপুর আর পতিসরের অংশ। সেই কারণে কবির শিলাইদহের বাসও উঠল। বাণীতীর্থের অস্তিত্ব শুধু স্মৃতি হয়ে রইল। তবুও ভুলতে পারেন না শিলাইদহকে। তাই জমিদারি হস্তান্তরের পরও যোগ একেবারে ছিন্ন হয়নি। শেববার শিলাইদহে এলেন ১৯২২-এ। দূর-দূরান্ত থেকে প্রজারা এলো তাদের কাছের মানুষ প্রাণপ্রিয় বাবুমশাইকে একনজর দেখবার জন্য। শিলাইদহবাসী কবিকে জানানো তাদের প্রাণঢালা সংবর্ধনা। কবি অভিভূত হলেন। পরে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা-সূত্রে যুক্ত ছিলাম আজো তোমাদের মন থেকে তা ছিন্ন হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানাস্থান থেকে পেয়েছি, তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে। কবির এই মুগ্ধতা ও আত্মতৃপ্তি জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহতেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার সাধের শান্তিনিকেতন। কিন্তু বিষয়-বিভাগ তাকে শিলাইদহ ছাড়া করল। বাইরের সম্পর্ক ছিন্ন হলো বটে, কিন্তু মনের যোগ ছিন্ন করবে কে! তার মনের ভেতরে নিভৃতে কাজ করে যেতে লাগলো শিলাইদহের স্মৃতি। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন ঃ কবির জীবনে, শিলাইদহের আকর্ষণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। শিলাইদহ তার কাছে কেবল জমিদারি মাত্র ছিল না। এই স্থানের আকাশ-বাতাস, নরনারী কবির হৃদয়ে চিরদিনই বাঁশি

বাজিয়েছে। পারিবারিক ভাগবাটোয়ায় শিলাইদহের পরিচালন-দায়িত্ব কবির হস্তচ্যুত হওয়ায় তার মনের গভীরে শেষদিন পর্যন্ত এক অপ্রকাশ্য বেদনাবোধ জাগরুক ছিল। তার এই মানসিক অবস্থা তার পারিবারিক পার্শ্বচররা নানা ইঙ্গিতে বুঝতে পারতেন। শিলাইদহের স্মৃতি কবির মনে কতখানি উজ্জ্বল ও গভীর ছিল তার জীবনসায়াহ্নে লিখিত একটি চিঠিতে তা জানা যায়। ১৩৪৬-এ শিলাইদহে অনুষ্ঠিত পল্লী-সাহিত্য সম্মেলনে আমন্দ্রণের জবাবে কবি লিখেছিলেন ঃ আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ আর সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, এই উপলক্ষে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলুম।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলালিত শিলাইদহ আজ কবি-তীর্থে পরিণত। রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহ ও পদ্মা এই তিনটি নাম একসূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রমনন ও সাহিত্যের প্রসঙ্গে এই নদী, জনপদ ও ব্যক্তির ত্রিভুজ যেন একক-অভিন্ন সত্তায় পরিণত কাউকে বাদ দিয়ে কারো পরিচয় পূর্ণ নয়।